বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ

ইমদাদুল হক মিলন

সবুজ মাঠ ভেঙে দৌড়াচ্ছে এক কিশোর। হাতে লম্বা সরু বাঁশের মাথায় বাঁধা বাংলাদেশের পতাকা। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে পতাকা। দৌড়ের তালে পত পত করে উড়ছে। গভীর আনন্দ উত্তেজনায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে কিশোর। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

এই ঘটনা ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের। বিক্রমপুরের এক গ্রামের মাঠ। বাংলাদেশের বহু অঞ্চল ১৬ তারিখের আগেই শত্রুমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি মিলিটারিরা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেদম মার খেয়েছে। মরে ভূত হয়েছে হাজার হাজার। আহত হয়েছে প্রচুর। যারা বেঁচে গেছে তারা কোনো রকমে পালিয়ে গেছে ঢাকায়। রাজাকার, আলবদর, আলশামসদেরও একই অবস্থা। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়েছে অনেকে, অনেকে গাঢাকা দিয়েছে। যারা ধরা পড়েছে তারা টের পাচ্ছে ৯ মাসে যে অত্যাচার বাংলার মানুষের ওপর করেছে তার মাসুল কীভাবে দিতে হয়।

যে মাঠে দৌড়াচ্ছিল কিশোর সেই এলাকা শত্রুমুক্ত। সূর্য অস্ত যাচ্ছে মাঠের ওপারে। একটা মাত্র রাত। তারপর আসছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যে রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, যেখান থেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' সেই মাঠেই আত্মসমর্পণ করবে নিয়াজি বাহিনী। সেই মাঠেই জন্ম নেবে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আগামীকাল বাংলার আকাশে উঠবে স্বাধীনতার সূর্য। সেই আনন্দক্ষণে ৯ মাসে ঘটে যাওয়া কত বেদনার কথা মনে পড়বে স্বজন হারানো বাঙালির। কত নৃশংসতার ঘটনা মনে পড়বে! কত ত্যাগ, নারীর সম্ভ্রম আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো এই বাংলা, সেই সব কথা মনে পড়বে।

২৫ মার্চের রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পাকিস্তানিরা শুরু করেছিল গণহত্যা। ঢাকা শহরকে চার ভাগে ভাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই রাতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকার ইকবাল হল আর জগন্নাথ হলের ছাত্রদের একত্র করল। জগন্নাথ হলের সামনে ছাত্রদের দিয়ে বিশাল গর্ত করাল। তাদের সবাইকে হত্যা করে ওই গর্তে মাটি চাপা দিল। ইউনিভার্সিটির টিচারদের মারল, সাধারণ কর্মচারীদের মারল। আশপাশের বস্তিগুলোতে আগুন দিল, শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে দিল। ঢাকা শহরের চারদিক হয়ে উঠল দোজখ। শুধু আগুন আর আগুন। শুধু গুলির শব্দ, কামানের শব্দ।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বাঙালি পুলিশরা প্রতিরোধ গড়েছিল। প্রচুর বাঙালি পুলিশ হত্যা করলো ওরা। ইপিআর জোয়ানদেরও একই অবস্থা। সদরঘাট টার্মিনালে রাতের লঞ্চে চড়ার আশায় যারা বসেছিল তাদের সবাইকে মেরেছে। রাস্তায় শুধু লাশ আর লাশ। পিচের কালো রাস্তা রক্তে লাল। জগন্নাথ কলেজের গেটের কাছে লাশের স্তুপ। নারায়ণগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের কাছে লাশ। পরদিন সকাল পর্যন্ত আগুন জ্বলেছে কোথাও কোথাও।

২৭ মার্চ দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল। সেই ফাঁকে ঢাকার মানুষ বুড়িগঙ্গা পার হয়ে জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। এপ্রিলের ২ তারিখে ফজরের সময় জন্তুরা ওপারে গিয়ে আক্রমণ চালালো ঘুমন্ত মানুষের ওপর। হাজার হাজার মানুষ মেরে ফেলল। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে কত যে বধ্যভূমি! ঢাকার রায়েরবাজারে, মিরপুরে। নয়টা মাসজুড়ে মানুষ মেরে ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে রায়েরবাজারে ফেলা হতো, মিরপুরে ফেলা হতো। বিহারিরা যোগ দিয়েছিল পাকিস্তানিদের সঙ্গে। এক যুবককে বাঁশে গেঁথে নিয়ে এসেছে নবাবপুরে। মায়ের কোল থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে আকাশে ছুড়ে দিয়েছে। তলোয়ার কিংবা বর্শা উঁচিয়ে ধরেছে সেই শিশুর দিকে। শিশুটি গেঁথে গেছে তলোয়ারে, বর্শায়।

চুকনগরের কথা বলি। চুকনগর হচ্ছে খুলনার ডুমুরিয়া থানায়। ওদিক দিয়ে ভারতে ঢুকে যাওয়া সহজ। প্রাণ বাঁচাতে মানুষ তখন বর্ডার পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছিল। প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে চলে গিয়েছিল ভারতে।

মে মাসের ২০ তারিখ। বহু মানুষ চুকনগরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাজারের ভেতর দিয়ে ভারতে ঢুকে যাবে। বর্ডার খুলে দিয়েছে ভারত সরকার। খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা গেল সেখানে। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা। চার ঘণ্টায় ২০ হাজার লোককে মারল। চুকনগর বাজার হয়ে গেল মৃত্যুপুরী। পাশের নদীটির পানি লাল। হাজার হাজার লাশের মধ্যে পড়ে আছে রক্তে ভেসে যাওয়া মৃত মা। কোলের শিশুটি অবুঝ। সে বেঁচে আছে। মায়ের বুকের দুধ পান করার চেষ্টা করছে...।

প্রতিদিন নানা বয়সি মেয়েদের ধরে আনা হতো রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। বিবস্ত্র করে আটকে রাখা হতো। উপর্যুপরি তাদের ওপর চলত নির্যাতন। মেয়েদের আর্তনাদে কাঁপতে থাকত আকাশ-বাতাস। মেয়েদের বিবস্ত্র শরীর সিলিংয়ের সঙ্গে টাঙানো হতো। মাথা নিচের দিকে, পা ওপরের দিকে। ওই অবস্থায় মারা গেছে কত মেয়ে!

যুবতীর নাম ভাগীরথী। বয়স আঠারো-উনিশ। পিরোজপুরের বাঘমারা কদমতলা গ্রামে বাড়ি। মে মাসের এক বিকেলে ট্রাকভর্তি মিলিটারি গেল সেই গ্রামে। পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিল, যাকে পেল তাকেই হত্যা করল। ভাগীরথীকে নিয়ে এলো ক্যাম্পে, তারপর পাশবিক অত্যাচার চালাল। দিনের পর দিন চলল এই নির্যাতন। ভাগীরথী একটা সময়ে জল্লুদের আস্থা অর্জন করলেন, ভালো রান্নার হাত, তাদের রান্না করে খাওয়াতেন। ভেতরে তাঁর আগুন জ্বলছে। প্রতিশোধ নেবেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করলেন। তাদের গ্রামে জল্লুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ৪৫ জনের মধ্যে ৪০ জনকেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে খতম করালেন। তারপর উধাও হয়ে গেলেন ভাগীরথী। তবে শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারলেন না। ধরা পড়ে গেলেন। ভাগীরথীকে ওরা পাশাপাশি দুটি জিপের সঙ্গে বিবস্ত্র করে বাঁধল। দুই জিপে দুই পা, দুই হাত। দুই জিপ দুই দিকে চালিয়ে দিল। ভাগীরথী কাগজের মতো ছিঁড়ে গেল...।

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে হাজার হাজার বাঙালিকে ধরে এনে হত্যা করা হতো। পাহাড়তলী হয়ে হাটহাজারীতে যায় ট্রেন। ট্রেন থেকে নামিয়ে জবাই করা হতো বাঙালিদের। ওই এক জায়গায়ই হত্যা করা হয়েছিল ১০ হাজারেরও বেশি বাঙালি। রমজান মাসের ২০ তারিখে ফয়'স লেক এলাকায় শত শত গলা কাটা মানুষের লাশ পড়েছিল। লেকের উল্টোদিকের পাহাড়ের তলায় শুধু যুবতী মেয়েদের লাশ। তারা প্রায় প্রত্যেকেই গর্ভবতী। ১০৮২টা লাশ ছিল সেখানে। এ রকম হাজার হাজার নৃশংস ঘটনা একাত্তরের ৯ মাসজুড়ে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকেই তাঁর কথামতো ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছিল বাঙালিরা। ২৫ মার্চের পর থেকেই বাঙালি জাতি শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধ। ধীরে ধীরে সেই যুদ্ধ রূপ নিল গণযুদ্ধে। পাকিস্তানি পা চাটার দল ছাড়া প্রত্যেক বাঙালি হয়ে উঠল যোদ্ধা। দেশের স্বাধীনতার জন্য যার যা কিছু আছে, বঙ্গবন্ধুর কথামতো তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে লাগল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া দখল করেছিল। ৩০ মার্চ ভোর ৪টায় বাঙালি বীর সৈনিকেরা, পুলিশ ও আনসার আর ছাত্র-জনতা মিলে কুষ্টিয়ার প্রতিটি মিলিটারি ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। বাঙালি সৈনিক, পুলিশ ও আনসারের সঙ্গে লাঠি-বল-ম নিয়ে যুক্ত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। সেদিন বিকেলের মধ্যে পাকিস্তানিদের সব ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। বাকি ছিল শুধু কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের ঘাঁটিটি। দুই দিন এভাবে যুদ্ধ চলার পর ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে শুরু করল পাকিস্তানি মিলিটারিরা। এলাকার সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তা কেটে রেখেছিলেন। রাস্তার কাটা অংশে চাটাই ফেলে তার ওপর আলকাতরা এমনভাবে মাখিয়ে রেখেছিলেন, দেখে বোঝার উপায় নেই কাটা রাস্তা। পাকিস্তানিদের ট্রাক আর জিপ সেই সব কাটা রাস্তায় পড়ে উল্টে গেল।

মুক্তিযোদ্ধারা গুলির পর গুলি চালিয়ে পাকিস্তানিদের মারতে লাগলেন। যারা এই আক্রমণ থেকে বাঁচল তারা ছড়িয়ে গেল চারপাশের গ্রামে। একজন পাকিস্তানি সৈনিকও সেখান থেকে জীবিত ফিরতে পারেনি। সাধারণ মানুষই তাদের মেরেছিল।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ আর সৈন্য ফেনীর ওপর দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানিদের। মুক্তিযোদ্ধারা এই অঞ্চলে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাদের প্রতিরোধে চুরমার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান বাহিনী। ডিসেম্বরের ৬ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধারা ফেনী বিলোনিয়া মুক্ত করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই যুদ্ধের কৌশল এখন পৃথিবীর বিভিন্ন সামরিক কলেজে পড়ানো হয়।

আমাদের সাত বীরশ্রেষ্ঠ তাঁদের জীবনের বিনিময়ে বিশাল অবদান রেখে গেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতায়। কত বীরত্বের ঘটনা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে। বাংলার দামাল ছেলেরা আর সর্বস্তরের মানুষ যে যাঁর জায়গা থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কিছু দেশদ্রোহী ছাড়া বাংলার প্রত্যেক মানুষ তখন মুক্তিযোদ্ধা।

পাকিস্তানিদের ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই ঘটছে না প্রমাণ করার জন্য পৃথিবীর বড়ো বড়ো দেশের সাংবাদিকদের ডেকে আনা হয়েছে। ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে রাখা হয়েছে তাঁদের। পরদিন সকালবেলা শান্তিপূর্ণ(!) ঢাকা শহর দেখাতে নেওয়া হবে। বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা গ্রেনেডে গ্রেনেডে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দেয়াল ধসিয়ে দিলেন। মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল এই ঘটনা। বিশ্ব জেনে গেল কী ঘটছে পূর্ব পাকিস্তানে! এইভাবে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগোচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

আগস্ট মাসের ৯ তারিখ। টাঙ্গাইল এলাকার ধলেশ্বরী নদীর তীরে পাকিস্তানিদের সাতটা জাহাজ এসে নোঙর করল। জাহাজগুলো অস্ত্রবোঝাই। বগুড়ার ফুলছড়ি ঘাটে খালাস করা হবে। সেখান থেকে রংপুর আর সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধারা মেজর হাবিবের নেতৃত্বে এই জাহাজগুলো দখল করেছিলেন। ফলে বিপুল অস্ত্র এসেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আরেক বিশাল অভিযানের নাম 'অপারেশন জ্যাকপট'। কর্ণফুলির জেটিতে অস্ত্রবোঝাই বড়ো বড়ো জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। মধ্য আগস্টে আমাদের ৬০ জন নৌ কমান্ডো তিনটি দলে ভাগ হয়ে, রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে সাঁতরে সেই সব জাহাজের কাছে পৌঁছালেন। ডুব দিয়ে দিয়ে জাহাজের গাঁয়ে লিম্পেট মাইন লাগিয়ে দিলেন। তারপর যে রকম নিঃশব্দে এসেছিলেন সে রকম নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। রাত ১টা ৪০ মিনিটে শুরু হলো বিস্ফোরণ। একের পর এক বিস্ফোরণ। পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য নিয়ে আসা অস্ত্রবোঝাই বিশাল বিশাল জাহাজ একটার পর একটা কর্ণফুলীতে ডুবতে লাগল। এইভাবে এলো আমাদের স্বাধীনতা।

১৬ ডিসেম্বরের দুই দিন আগে জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্য কুটিল পাকিস্তানিরা রাজাকার, আলবদরদের সহায়তায় শেষ আঘাত হানল। বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য হত্যা করল বহু বুদ্ধিজীবীকে। তারপর ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে মাথা নিচু করে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়াজীর নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করল। স্বাধীন হলো প্রিয় বাংলাদেশ।

সেই চূড়ান্ত আনন্দের ক্ষণে বাঙালি জাতির একটিই অপেক্ষা, আমাদের প্রিয় নেতা কবে ফিরে আসবেন তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে? বাংলার আকাশ অপেক্ষা করতে লাগল বঙ্গবন্ধুর জন্য, বাংলার মাটি অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশে। মুহূর্তে আলোয় আলোয় ভরে গেল বাংলাদেশ। স্তব্ধ হয়ে থাকা নদী বইতে লাগল নিজের ছন্দে। পাখিরা গান ধরল। ফুলেরা ফুটে উঠল। ফসলের মাঠ পূর্ণ হলো। স্বাধীন দেশের মায়াবী হাওয়া বইতে লাগল। আর বাংলাদেশের হৃদয়ে বেজে উঠল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।